ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় পুনর্বিবেচনা

সৌমিত্র বসু

আমরা, যারা সাধ্যমত বাংলা বিদ্যার চর্চাকরে থাকি, ঠিক জানি না তাদের মধ্যে কতজন খেয়াল রেখেছি,সামনের বছর স ার্ধ জন্মশতবর্ষে প্রবেশ করবেন এক সাহিত্যিক, আমাদের কথাসাহিত্যের চৌহদ্দিতে যিনি খুবই অন্যরকম হাওয়া এনেছিলেন। তাঁর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা, কিন্তু প্রখ্যাত রথী মহ ারথীদের আলোকোজ্বল মূর্তির থেকে দূরে একটু অবহেলিত হয়েই রয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আধুনিক প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেন, তার প্রমাণ বোধহয় খুব বেশি মিলবে না।

আমি একথা বলতে চাই না যে বিপুল কোন আগ্রহ পাওনা ছিল ত্রৈলোক্যনাথের। বরং দেখাতে চেষ্টা করব, অবহেলিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাঁর রচনার মধ্যে। কিন্তু তবু, তাঁর লেখায় যদি একটু মন দিতাম আমরা, কথাসাহিত্যিক হিসেবে সীমাবদ্ধতাকে বিশ্লেষণ করে যদি কোন শিক্ষা নিতে চাইতাম, তাহলে আর একটি ধারায় সম্পন্নতর হয়ে উঠতে প ারত আমাদের সাহিত্য এবং আমার বিনীত ধারনা, আধুনিক সময়ের তীব্র, অস্থির, কোন একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের কাঠ ামো থেকে অনবরত ছিটকে যেতে চাওয়া আততি যোগ্য ভর পেতে পারত ওই গলিতে। আরো একটি কারণে ত্রৈলোক্যন াথ আমাদের পাঠ্য বলে মনে হয়। এই একজন মানুষ, জীবন যাঁর ওপর লাফিয়ে পড়েছে সমুদ্রের ক্ষুধিত ঢেউয়ের মত, অমিত বিক্রমে তার সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি, শেষ অবধি জিতে নিয়েছেন তাকে। সাহিত্যিক হিসেবে শুধু নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি নিশ্চয় আমাদের মনোযোগের যোগ্য।

১৮৪৭ সালের ২১ জুলাই ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম, মারা যান ৩ নভেম্বর ১৯১৯, তিয়াত্তর বছর বয়সে। প্রথম গ্রন্থ কঙ্কাবতী প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তখন তাঁর। তাহলে, জন্মসূত্রে তিনি বঙ্কিম যুগেরই মানুষ, তঁ ার চেয়ে ন-বছরের ছোট। রমেশচন্দ্র দত্তর চেয়ে এক বছরের এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেয়ে ছ-বছরের বড়।

যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখলে ত্রৈলোক্যনাথের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হতে পারে। লক্ষ্য করব, এঁরা কেউই শুধু উপন্যাসকার নন, প্রাবন্ধিকও বটে, এবং এঁদের মধ্যে অন্তত হরপ্রসাদ প্রাবন্ধিক হিসেবেই কীর্তিমান বেশি। প্রসঙ্গ ত এইসব প্রবন্ধের প্রায় সবটার বিষয় হল ইতিহাস, ধর্ম, পুরাণ প্রভৃতি, যাদের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ বেশ প্রত্যক্ষ। বঙ্কিম - রমেশ হরপ্রসাদরা সাহিত্য বিষয়ক অজস্র প্রবন্ধও রচনা করেছেন, তাদের কথা তো মনে করিয়ে দেওয়াই বাহুল্য। এর বিপরীতে ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্য বিষয়ে কোন প্রবন্ধ রচনা করেন নি, তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল বিজ্ঞান-- ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞ ান সভা। ইহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ও অভাব গ্রন্থটি অমৃতলাল সরকারের সহয়োগে সংকলন করেন। এছাড়া ইংরেজিতে লেখেন বেশ কিছু কেজো বই, যেমন A Descriptive Catalogue of Indian Products contributed to the Amsterdam Exhibition 1883, A Handbook of India Products (Art Manufactures and Raw Materials) -(১৮৮৩), A list of India Economic Products of India, exhibited in the Economic Court, Calcutta International Exhibition 1889-84 (১৮৮৪), Art – Manufactures of India (Specially compiled from the Glasgow International Exhibition (1888) - (১৮৮৮)।

এ ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের ইংরেজিতে একটি ভ্রমণ বিবরণ আছে, ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত --A visit to Europe. লক্ষণীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বঙ্কিম - রমেশ - হরপ্রসাদদের মত ত্রৈলোক্যনাথ কখনোই ইতিহাসকে তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় করেন নি। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি সবসময়েই বর্তমানকালে অথবা অদূরঅতীত, চরিত্ররা কেউই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নন। এও বলা যেতে পারে, উচচবিত্ত মানুষদের তুলনায় সাধারণ মানুষ, পরিশ্রমে সততায় যারা নিজের জীবন তৈরি করে, তারাই ত্রৈলোক্যনাথের প্রশ্রয় পেয়েছে বেশি। এ লেখকের বিশ্বাস, এইসব মানুষের মধ্যে নিজের জীবন যুদ্ধকে দেখতে চেয়েছেন বলেই এদের সম্পর্কে তাঁর মনে আলাদা দুর্বল জায়গা আছে।

উনিশ শতকের যে পর্বে বঙ্কিমের নেতৃত্বে তৈরি হয়ে উঠছে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি বেগবান ধারা, আমরা জানি সেই সময়ের সুর বাঁধা ছিল চড়া পর্দায়। এই সময়ের সাহিত্য আশ্রয় করছে পুরাণের কাহিনী, টডের রাজস্থান উপাখ্যান, অমিতাভ বা খ্রীষ্টর উপাখ্যান--এদের প্রকাশও করা হচ্ছে বেশ উচচকিত ভঙ্গিতে। ব্যতিত্রম হিসেবে মনে পড়তে পারে অ াত্মমগ্ন বিহারী লালের মত কারো কথা, কিন্তু প্রধান প্রবণতা ছিল মনন ও যুক্তিবাহিত মহৎ মূল্যবোধের দিকে। সাহিত্যের স ামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে চিন্তা করছেন প্রতিষ্ঠিতরা, বঙ্কিমচন্দ্র উপদেশ দিচ্ছেন, যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।১ মনে রাখা ভাল, বঙ্কিমের মতে সৌন্দর্যসৃষ্টিও কিন্তু মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই, সৌন্দর্য উপভোগের সুখ যাঁরা দেন, তাহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্বোচচ পদপাপ্তির যোগ্য।২

তাঁদের প্রবন্ধে, তাঁদের সাহিত্যতত্ত্বে এবং অবশ্যই তাঁদের কথাসাহিত্যে এই লেখকেরা তাহলে চেষ্টা করছিলেন একটি বিশেষ মূল্যবোধেব আলোয় পৌরাণিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বা সমকালকে প্রকাশ করতে, সমকালীন পাঠকের মনে উচচভ াব সঞ্চারিত করতে। সে চেষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ করেন নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই তিনি একাজ করেছেন সম্পূর্ণ আলাদা এক ভঙ্গিতে, যে ভঙ্গি যেমন বঙ্কিম - রমেশচন্দ্রদের সঙ্গে মিলবে না, তেমনিই বোধহয় মেলা কঠিন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সঙ্গে।

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই দুই লেখক একটা ধারা তৈরি করেছিলেন, ব্যঙ্গ সাহিত্যের ধারা। গত শতাব্দীতে বাংলার শিল্পকর্মে ব্যঙ্গের ফসলও যথেষ্ট ফলেছে। তার কারণ বোধহয় এই, যে যুগ মহৎ মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে চায়, সে মূল্য বা নীতিবোধের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অসামঞ্জস্য দেখে পরিহাসে বিদ্রূপে ফেটে পড়া তার পক্ষেই স্বাভাবিক। আব ার এর বিপরীত দিকে, পরিবর্তনের ব্যাপারে যাঁরা রক্ষণশীল, ব্যঙ্গ যুগে যুগে তাঁদের হাতেও অস্ত্র হয়ে এসেছে। আমাদের মনে হয় যুক্তি তর্ককে লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাবার যে স্বাধীনতা ব্যঙ্গের আছে, তারই সুবিধা নিয়েছেন রক্ষণশীলেরাও।

ইন্দ্রনাথ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম প্রভেদ এই, ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতিবোধ অন্য দুজনের মত ব্যাপকভাবে আধুনিক পাঠককে প্রতিহত করবে না। প্রথম দুজন তাঁদের গুত্বপূর্ণ লেখা শুকরেছেন আশির দশকের মাঝ ামাঝি, খুব স্পষ্ট সামাজিক কারণে তাঁদের মধ্যে তীব্র ব্রাহ্ম বিরোধিতার আঁচ পাওয়া যাবে। ত্রৈলোক্যনাথ এই ধরনের ধর্মীয় আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রনাথ বা যোগেগন্দ্রচন্দ্রে ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ, সেই কারণেই তার ঝাঁঝ খুব বেশি ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ব্যঙ্গকে অনেক বেশি অপ্রত্যক্ষতায় নিয়ে যেতে পেরছেন, তাঁর লেখা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না। ত্রৈলোক্যনাথ প্রায়ই চলে যান অসম্ভবের জগতে, বাস্তবের মাধ্যাকর্ষণকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে তাঁর ব্যঙ্গ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, কোথাওসংঘাতের বেদনা বাজে না।

কোথা থেকে ধরা দিল এই নির্ভার অলীক তাঁর কাছে ? তিনটি সূত্রের কথা মনে হচ্ছে আমার। প্রথম, আবহমানকাল ধরে বয়ে আসা রূপকথা লোককথার গল্প, যার ঐতিহ্য দেশে বিদেশে ছড়ানো আছে। লোকসাহিত্যের এই প্রভাব যে ত্রৈলে াক্যনাথের ওপর খুব বেশি ছিল তা বোঝা যাবে তাঁর বহু লেখার প্রকাশভঙ্গিতে, এ ছাড়া কঙ্কাবতী হল উপন্যাসের গোড় াতেই জানিয়ে দেওয়া একটি লোককাহিনীর সম্প্রসারণ, মুক্তা-মালা বা মজার গল্পের মধ্যে বেশ কিছু লোককথা জায়গা পেয়েছে।

দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে বলতে পারি বিদেশি সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর অভ্যস্ত পাঠের তালিকাটি মোটামুটি এই-- পড়তেন Englishman, Strand, Windsor, Nove, Wide World, Pearson, Royal, National, Titbits, Mr. Stead সম্পাদিতScientific American প্রভৃতি পত্র পত্রিকা। প্রিয় লেখক ছিলেন W. W. Jacobs, P. G. Wodehouse, Lewis Carroll, Arther Conan Doyle, Mark Twain, অথবাCharles Dickens. এই তালিকা থেকে ত্রৈলোক্যনাথের পৃথিবী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারা যাবে। তাঁর অলীক জগৎ তাহলে চারপাশের ভুবনকে প্রত্য াখ্যান করে তৈরি হচ্ছে না, দেশ আর বিদেশ সম্পর্কে গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ পাচ্ছে, উদ্ভাসিত হচ্চে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ। নিজেকে জীবন্ত তথা অবিরত উদ্ভাবনশীল রাখার এই ধরন কর্মক্ষেত্রে তাঁকে বিশিষ্ট সম্মান দিয়েছিল, ত্রৈলোক্যন াথকেও বুঝতে পারি এই পাঠাভ্যাস থেকে।

প্রিয় সাহিত্যিকদের তালিকাটিও পাঠক লক্ষ্য করবেন। লুইস ক্যারল যে থাকবেন এখানে তা তো ধরতেইপারা যায়, কিন্তু

সেই সঙ্গে আছেন কোনান ডয়েল, তাঁর দমচাপা রহস্য আর অতি ধীরে, প্রায় অলক্ষ্যে প্লটের জট খোলার মুন্সিয়ানা নিয়ে অসাধরণ গল্পবলিয়ে ডিকেন্স আছেন, আছেন মজাদার ওডহাউসের সঙ্গে ডিকেন্স ঘরানার ডব্লু ডব্লু জেকব, সাধারণ মানুষের সহজ জীবন নিয়ে যিনি চেষ্টাহীন মজা করতে পারেন। জেকব এবং মার্ক টোয়েন, দুজনের অভিজ্ঞতা তৈরিতেই নদী বেশ গুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, এই প্রগাঢ় অভিজ্ঞতাই হয়তো তাঁদের স্নিগ্ধ স্বাদু এক রসিক মনের অধিকারী করে তুলেছেন। এই মনের সুর ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বাঁধা সহজ মনে হয়।

এর পাশাপাশি মনে রাখব তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। সংসারে বড় কষ্ট। রোগে, দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে বাটী হইতে নিদ্দেশ হইলেন।৪ মনে করিয়ে দিই, তখন তাঁর বয়েস আঠারোও হয়নি। সাহিত্যসাধক চরিতমালা-র ছত্রিশ সংখ্যক পুস্তিকায় লেখা আছে নিদ্দিষ্ট হবার পরের বিবরণ, যে কোন অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের সঙ্গে তা অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে । দিনের পর দিন পদব্রজে ভ্রমণ, নিয়মিত অনাহার, কখনো আসামের চা বাগানে কুলি যোগানদারের ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসা, ডাকাতের হাতে পড়া, নৌকাডুবি, প্রভৃতি অজস্র ঘটনা ঘটেছে এই পর্বে। বলতে পারি, উনিশ শতকের যে কোন খ্যাতকীর্তি সাহিতিক্যের তুলনায় ত্রৈলোক্যনাথজীবনের ওঠাপড়ার মুখোমুখি হয়েছেন অনেক বেশি।

এই খর দিনের শেষে শু হয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন। আমাদের বিশ্বাস, উতরোল অভিজ্ঞতার প্রান্তে এসে মানুষ গ্রহিষ্ণু স্থিতধী হয়ে পড়েন, দৃষ্টিভঙ্গিতে খানিকটা দাহহীন প্রশ্রয় চলে আসে। ত্রৈলোক্যনাথের লেখা এই মতকে সমর্থন করবে। সেই বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে আর কারো কারো মত প্রবলরকম হিন্দু হয়ে উঠছেন না তারকারণ বোধহয় তাঁর অভিজ্ঞত াঋদ্ধ মন তাঁকে যে কোন প্রথাগত গন্ডির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। নীতিকথা ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় কম নেই, কোথাও খুব স্পষ্ট ধর্মীয় আবরণেও আছে, কিন্তু তাতে কখনোই অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের ঝাঁঝ লাগে নি।

আর একটা কথা মনে হয়। বাস্তবই, যখন আমাদের প্রাত্যহিকতার থেকে আলাদা এক রূপ নিয়ে আসে, তখন কি তা অলীকের জন্ম দিতে পারে না? ভূমিকম্পে যখন ফেটে যায় পায়ের তলার নিশ্চিন্ত মাটি, আগ্নেয়গিরি থেকে যখন ছাই আর আগুন - লাল লাভা ঢেকে দিতে থাকে জনপদ, সেই বিশালকে দেখার অভিজ্ঞতা কি ফ্যান্টাসি দেখার অভিজ্ঞতারই কাছাকাছি যায় না ? ত্রৈলোক্যনাথ যখন দেখেন-- একটি সামান্য মাটির ঢিপি জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায়, ইহার কেবলমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল, ---সেই স্থানে তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, ---কিছুই নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, --- কেবল ঘাড় কাঁপাইতে থাকে, কোথায় বাড়ী কে তাহারা, কি করিয়া তাহারা এই মাটির ঢিপিতে আসিল, কে তাহাদিগকে ফেলিয়া গেল, --তাহারকিছুই তাহারা বলিতে পারে না। ৫ তখন এই দৃশ্য কোন সুররিয়ালিস্টের আঁকা বলে মনে হতে থাকে। ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে, বলা বাহুল্য, সুররিয়ালিজম খোঁজার কোন ইচছা বর্তমান লেখকের নেই, শুধু মনে রাখব, অলীকের যে সবস্তর তৈরি করেন তিনি, তার অনেক জায়গাতেই সে অলীকতা আসলে চেনা - অচেনা বাস্তবের কিছু তীব্রতর প্রকাশ, উদ্ধৃত দৃশ্যটির মতই।

যার বাংলা করেছি অলীক, আমাদের আলোচনা ঢুকে পড়েছে সেই ফ্যান্টাসির জগতে। কেন তার আশ্রয়নেবেন একজন লেখক ? কয়েকটি কারণের কথা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। ক. যে কোন শিল্পীই নিজস্ব ভুবন গড়ার স্বাধীনতা চান, তাঁর মনে হতে পারে, সম্ভাব্যতার দাসত্ব করতে গিয়ে বিড়ম্বিত হচ্ছে সেই স্বাধীনতা। তখন তিনি ইচ্ছেমত সেই সম্ভাব্যতা অস্বীকারের চুক্তিই করে নিতে পারেন পাঠকের সঙ্গে। খ. আবহমানকালের কোন সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকসময় অব্যবহিত বর্তমানকে অস্বীকার করে চলে যাওয়া হয় ইতিহাস বা পুরাণের আধা চেনা জগতে। সেই একই ভাবনা কাউকে নিয়ে যেতে পারে অলীকের দুনিয়ায়। গ. আমরা যখন ব্যঙ্গ করি, তখন তো তথ্যকে কিছুটা বিকৃতই করে নিই। ব্যঙ্গপ্রবণ লেখার পটভূমি হিসেবে অলীককে এই যুক্তিতেই বেছে নেওয়া যায়। শুধু ব্যঙ্গ নয়, নির্মল মজাও খানিকটা বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেয়, যে অসংলগ্নতা কৌতুক তৈরি করে তা তো অলীকেরই নামান্তর মাত্র। ঘ. উপমার সঙ্গে অলীকতার একটা গোপন সম্পর্ক আছে। কাঠির মত হাত পা, পাহাড়ের মত মানুষ , অথবা স্বর্গের পতাকার মত শাড়ির আঁচল ঠিক বাস্তবের কাঠামোয় বর্ণনাকে আটকে রাখে না। এদের আর একটু অতিকৃত রূপ দিলে তা অলীক জগতে চলে যেতে পারে।

যে কারণগুলির কথা বললাম তা মানলে হয়তো এও মানতে হবে যে এই অদ্ভুতের একটা শিকড় থাকে চেনা জগতেরই মাটিতে। এমন কি এতটাই হয়তো বলতে পারি, অলীকের মধ্যে সেই চেনা জগৎকেই প্রকাশ করতে চাইছেন ত্রৈলোক্যনাথ, স

াধারণের থেকে আলাদা একটা দৃষ্টিতে। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি এখন যেভাবে গঠিত, সেইভাবে আমরা গুণাদি অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয় সমুদয় অন্যরূপে গঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ আব ার অন্যরূপ ধারণ করিত। ....কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া স্বপ্নসৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি। সে জন্য কনকাবতীর স্বপ্নকেআমরা উপহাস করিব কেন ? সমুদয় বাহ্য জগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়কল্পিত । দুই জগতে বিশেষ কিছুশিল্পদর্শন ইতর বিশেষ নাই। বুঝতেই পারা যায়, কঙ্কাবতীর স্বপ্ন প্রসঙ্গে নিরঞ্জনের এই ব্যাখ্যা আসলে লেখকেরই মত, এবং একটি শিল্পদর্শন হয়তো প্রকাশ পায় মন্তব্যটিতে। অনালোকিত দিক থেকে সত্যকে দেখার অস্ত্র হিসেবে স্বপ্নের ব্যবহার বঙ্কিম, রমেশ প্রমুখ অনেকের লেখাতেই প াব, তবে বলাই বাহুল্য ত্রৈলোক্যনাথের মেজাজ তাঁদেরথেকে আলাদা, এবং সেই মেজাজেরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বপ্নেরা তঁ ার লেখায় প্রায় নিয়মিত এসে থাকে।

স্বপ্নময় কঙ্কাবতী, বীরবালা-তে তো বটেই, ত্রৈলোক্যনাথের অন্য লেখাতেও এই স্বপ্নের আবহ বুনে দেওয়াহয় কখনো বৈঠকী আষাঢ়ে আড্ডার মেজাজে, কখনো বা চরিত্রদের নেশার ঝোঁকে। আমরা লক্ষ্য করব, স্বপ্ন, গপ্পো(বা গল্প) বা নেশ ায় অসম্ভব সেই পৃথিবীর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে রচনাকারের সমকাল, তার বাস্তবের সমস্ত তিক্ততা নিয়ে, আর এ দুয়ের মধ্যে খুব সহজ সেতু রচিত হতে চায়।

ধরা যাক কঙ্কাবতী। এর বাস্তব পটে আছে ধর্মভী বংশজ রামতনু রায়, কৌলীন্য প্রথা, বৃদ্ধের হাতে সম্প্রদান, পুষশাষিত সংসারে নারীর অসহায়তা, গ্রাম্য দলাদলি, এই গ্রাম্যতার থেকে বেরিয়ে একটি বড় অর্থময় জীবনের দিকে যে যেতে চায় সেই খেতুর বিদ্ধে যড়যন্ত্র ইত্যাদি। কাহিনী অলীকের জগতে চলে যাবার পর যে সব চরিত্র আসে, তারাও কম বেশি এই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে স্কেল আর স্কেলিটন মিলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ভূতে অবিশ্বাসীদের সনাতন বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাদের পরিকল্পনা হল যেখানে - সেখানে গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদপত্র বা হির করিব। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমরা একটি কোম্পানী খুলিয়াছি। সে কোম্পানীর নাম যে ইংরেজিতে দিতে হল তার কারণ বাঙলি নামের সংস্থাকে কেউই বিশ্বাস করে না। এছাড়া, যে তাদের অনুগামী হবে তাদের অর্থ দেওয়া হবে, কেননা লোককে ভক্ত করিতে হইলে অর্থদান একটি তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্ম্মবান, অতি ভক্তিম ান মহাপুষ হয়।

উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলে বরং দেখা যাক কঙ্কাবতী-তে এই সব অবাস্তব চরিত্ররা কি কি বাস্তব উপদেশ দিয়ে শিশিক্ষু চরিত্রটির এবং পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি করছে। ১. বিবাহে ভাঙ্চি অতি নির্মল আমোদ, ২. বাংলা কথা বললে ব্যাঙের জাতি য াবে, সাহেবের পোষাক পরাও সেই জন্যেই, ৩. মশারা রক্ত শোষণ করবেন বলেই মানুষের সৃষ্টি, ৪. দেশভ্রমণ খুব খার াপ, দেশভ্রমণে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহলে মানুষ আর মশাদের বশ্যতা স্বীকার করবে না, ৫. আকাশের সিপাহী দাঙ্গা হাঙ্গ ামার সময় তফাৎ থাকতে চায়, পৃথিবীর তাই নিয়ম ৬. ধর্মভূমি ভারতবর্ষে সতীদাহপ্রভৃতি সব পুরনো প্রথা আবার চালু করা উচিত ইত্যাদি। বুঝতেই পারা যাচ্ছে, হিন্দু পুনর্জাগরণের সমকালীন বাংলাদেশ, ইংরেজ শোষণের পটভূমি প্রভৃতি চলে আসছে এইসব অংশে, এবং তনু রায় জনার্দন ষাঁড়ের অধ্যুষিত জগতেরই একটা বিকৃত সম্প্রসারণ পাওয়া যাচ্ছে চরিত্রগুলি আর তাদের ব্যবহার বা মন্তব্যে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের যেটা বড় গুণ, এইসব কথা তাঁর চরিত্ররা বা কখনো স্ বয়ং তিনি বলছেন অতি নির্বিকার ভঙ্গিতে, মন্তব্যহীনভাবে। লেখকের এই নির্বিকার ভঙ্গি পাঠকের মনে বেশি করে ব্যঙ্গের জ্ব ালা ধরিয়ে দিতে পারে।

শুধু কঙ্কাবতী নয়, স্বপ্নসম্ভব অন্য আখ্যানগুলিতেও এইরকম মন্তব্য প্রায় নিয়মিত পাওয়া যাবে। তার কয়েকটিই মাত্র প্রসঙ্গ নির্বাচন করে নিলে তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা আন্দাজ গড়ে উঠতে পারে। আমরা দেখব, ত্রৈলোক্যনাথ একদিকে যেমন ধর্মীয় শোষণের বিদ্ধে কথা বলছেন, অন্যদিকে তেমনি বিদেশি শাসনের অর্থনৈতিক তাৎপর্যও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট। তাঁর ধর্মগুরা কখনো প্রভুত্ব দেখাবার জন্যে শিষ্যকে নিয়মিত চিমটে দিয়েপ্রহার করে, কন্যা সন্তানকে মাটির তল ায় পুঁতে রেখে দেয়। কঙ্কাবতী-তে শিরোমণির সঙ্গে ঠ্যাঙাড়ে দলের ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। মুক্তা মালা-য় গুদেব শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলোক চক্রবর্তী মহাশয় মাংসের দোকান করেছেন, সেখানেমিথ্যাচার, প্রবঞ্চনার ঢালাও কারবার, পশুদের প্রতিও নির্দয় ব্যবহার তাঁর। ময়না কোথায় ! উপন্যাসেও গুদেবের সঙ্গে মাংস বিক্রির ব্যবসা জুড়ে দেওয়া হয়। ত্রৈলোক্যনাথ

এদের মধ্যে বর্ণকুলীনের প্রভুত্বের আকাঙক্ষা আর অর্থকুলীনের নীতিহীন বেনিয়া অর্থলোভকে মেলাতে চাইছেন। এই ভন্ডামির পাশাপাশি অবশ্য তিনি রেখে দেন কঙ্কাবতীর নিরঞ্জন বা খেতুর মত কোন চরিত্র, ত্রৈলোক্যনাথের ধর্মবোধ যাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

আবার খৃষ্টান ধর্মগুদের সম্পর্কেও তাঁর বিবেচনা খুব স্পষ্ট। কঙ্কাবতীতে খেতুর কণ্ঠস্বরে তিনি পাদরি সাহেবকে যখন মনে করিয়ে দেন, আবার আমেরিকার কালা - খ্রীষ্টানদিগের উপর আপনাদের যেরূপ ভ্রাতৃ ভাব, তা যখন লোকে শুনিবে, আর আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়া মায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে ন, সব খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। --- তখন ধর্মকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক স্তরে শোষণের চেহারাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাস্তবের এই স্তর থেকে যখন ফ্যান্টাসিতে চলে যান ত্রৈলোক্যনাথ, তখন, একটু আগেই বলেছি, এ বিষয়ে কথা বলে খেতুর মত ব্যবস্থাটির প্রতিবাদী কোন চরিত্র নয়, এই ব্যবস্থাকে নিজের স্বার্থের কারণে সমর্থন করে এমন কোন চরিত্র। যেমন, লুল্লুতে ভূত বলে, দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়ে থাকে, যদি কায়মনচিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একবার নির্ধন হইয়া যাইতেছে,বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে। ভাল, কাপড় না পরিলেই তো হয় ? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে ত আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলেনা চড়িলেই হয় পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী - বন্দাবন যাও না ? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনোই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, অধিকৃত উপনিবেশে শিল্পবিপ্লবের ভাল মন্দ দুটি দিককেই কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে।

পত্র পত্রিকাও ত্রৈলোক্যনাথের আত্রমণের লক্ষ্য হয়েছে বার বার। লুল্লুতেই আমীর ভূত ধরে রাখে, কেননা মানুষে যা কিছু গালি জানে পত্রিকার মানুষ সম্পাদকেরা তা সব খরচ করে ফেলেছেন, আমীর যে পত্রিকা খুলবেনতার সম্পাদক করা হবে ভূতকে, তখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে। নয়নচাঁদের ব্যবসায় আছে, কলেজের এম-এ পাশ করা ছেলেরা শীতলার বক্তৃতা করে, খবরের কাগজে শীতলার নাম ওঠে, ফিরিঙ্গিরা শীতলার পূজা দিতে আসে--- ত্রমে আমি ডাক্তার হইলাম। টাকাকড়ি ঘরে ধরে না। বসন্তর জম - চরিতে পাব বাঙালির হুজুগ বিষয়ে মন্তব্য, তার অন্যত্র দেখব, যম বলছেন, পৃথিবীতে গিয়া কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে তাহার আমি বিচার করি না, মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি।

এই প্রবন্ধে সম্ভবত ত্রৈলোক্যনাথের আরো দু একটি প্রিয় প্রসঙ্গের অনুল্লেখ থেকে গেল, কিন্তু এর মধ্যে বোধহয় দেখানো গেছে সে তাঁর অসম্ভবের জগৎ তাঁর সমকালীন সম্ভবপরতার জগতের সঙ্গে কতটাই সম্পর্কিত, এইসমকালীনতার প্রকাশের সঙ্গে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতাও মিলে যেতে চাইবে তা তো খুব স্বাভাবিক। আমরালক্ষ্য করব, কঙ্কাবতীতে খেতুর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা (দশম পরিচ্ছেদ), বাঙ্গাল নিধিরামের একাধিক অভিজ্ঞতা ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর জীবন থেকে তুলে এনে ব্যবহার করেছেন। অন্য বেশ কিছু লেখাতেও এই ধরনের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাস্তবের সঙ্গে অলৌকিককে মেলানোর ধরন যে সব উপন্যাসেই বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ এমন নয়, এবং অসম্ভবের জগতে পাঠককে নিয়ে যাবার পেছনে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য কাহিনীর গভীরে সত্রিয় ছিল, পাপের পরিণাম বা ময়না কোথায় উপন্যাসে তা অনেকটাই প্রকাশ্যে চলে আসে। কিন্তু স্পষ্টত নীতিপ্রচারক এই দুটি উপন্যাস নিয়ে কথা বলবার আগে আমরা সম্ভবপর কাহিনী নিয়ে লেখা ফোকলা দিগম্বরে-র দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারি। তার প্রথম কারণ, সময়ের দিক থেকে ফোকলা দিগম্বর আগে লেখা, ভূত ও মানুষ এবং মুক্তা - মালা ---এই দুটি অলীকনির্ভর বইয়ের মাঝখানে তার স্থান, আর দ্বিতীয় কারণ হল, এই সম্ভবপরতানির্ভর উপন্যাসেও ত্রৈলোক্যনাথ মাঝে মাঝে যুক্তিবুদ্ধির বেড়া ডিঙিয়ে যেতে চান, কোন কোন অতিকৃত ঘটনা সংস্থান অথবা দিগম্বর বা তাঁর স্ত্রীর চরিত্রায়ণে এই বিশেষ প্রবণতা ধরা পড়ে। ফোকলা দিগম্বরে-র একাধিক ঘটনা, সামাজিক নিয়মনীতি বা চরিত্রের ধাঁচা তাঁর কঙ্কাবতী ডম চরিত্র প্রভৃতি অলীক বিষয় নিয়ে লেখা উপন্যাসের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। ফোকলা দিগম্বর প্রসঙ্গে বিশেষভাবে এই কথাটি মনে হয় কারণ দিগম্বরে যে বিয়ে পাগলা বুড়োর চরিত্র- ধাঁচা গ্রহণ করছেন তিনি, কঙ্কাবতী বা ডমর মত বিখ্যাত লেখায় তার কমবেশি

প্রয়োগ চোখে পড়বে।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত ময়না কোথায় আর ১৯০৮ সালে প্রকাশিত পাপের পরিণাম উপন্যাসেও ত্রৈলোক্যনাথ সম্ভবপরতার কাঠামোয় থাকতে চেয়েছেন, কিন্তু ঘটনা বা চরিত্রের বিন্যাস সবসময়েই যুক্তি মেনে চলতে পারে নি। এই দুটি উপন্যাসে নীতিশিক্ষার চাপ আছে, অসম্ভবের গল্পে যা হয়তো দিব্যি ঢাকা পড়ে যায়, এখানে তা আধুনিক পাঠকের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর ভাবে বেরিয়ে এসেছে। দুটি উপন্যাসেই খারাপ ভালর দ্বন্দ্ব খুব স্পষ্ট, ময়নাকোথায় উপন্যাসে যাদব প্রায় দেবচরিত্র, কোন মানবিক ত্রুটি নেই তার, অন্যদিকে মাশ্চটক হল সর্ব অর্থেই খারাপ লোক, সামান্যতম সৎগুণ দিয়ে এই খলতাকে সহনীয় করে তোলার চেষ্টা হয় নি। পাপের ও চরিত্রের বিভাজন সেইরকমই। খেতু বনাম তনু রায় ষাঁড়ের প্রভৃতির একমুখী শাদাকালো বিভাজনকে রূপকথার আবহাওয়ায় অসংগত মনে হয় নি।

দুটি উপন্যাসেই অলৌকিকতার ব্যবহার আছে, কিন্তু তাকে ঠিক ফ্যান্টাসি বলা যাবে না। ময়না কোথায় উপন্যাসে এমন কি পুরাণ কথার ধরনে দেবকন্যাদেরও আবির্ভাব হয় যাদব ও প্রভাকে নিয়ে যাবার জন্য। পাপের উপন্যাসেও ভাল খার াপ মানুষের সরল ছক কাজ করেছে, জটিল আলোছায়ায় চরিত্রগুলি জীবনসম্ভব সেই আশর্চ্য রহস্যময়তা পাচ্ছে না। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা উপন্যাসে যে ব্যাপক স্বাদ বদল ঘটে গেছে তার তুলনায় এই দুটি রচনাকে অসার্থক বলতেই ইচ্ছে হয়।

এই অসার্থকতার আরো দুটি কারণের কথা বলা যায়। ময়না কোথায় এর মত, কিংবা তার চেয়ে বেশি করে অলৌকিক অসম্ভাব্যতা চলে আসে পাপের পরিণাম গল্পে, এবং কাহিনীকাঠামো সেই অলীকের জন্য প্রস্তুত থাকে না বলেই ঘটনাপ্রব াহের অজস্র আকস্মিকতা, বিশেষ করে খাঁদা ভুতের প্রসঙ্গ সেই কাঠামোকে চুরমার করে দিতে চায়। অসার্থকতার দ্বিতীয় কারণ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ ধর্মের দিকে ঝুঁকছিলেন, এবং তাঁর সেই ধর্মভাবনাবেশ আরোপিতভাবে এসে পড়ে উপন্যাসের ওপর। হঠাৎ গল্প থামিয়ে বইয়ের ভাষায় উপদেশ দিতে থাকেন মহাত্মারা ---দীর্ঘ সময় জুড়ে। ১৯১২ সালের কাছাকাছি যে তিনি দেওঘরে তপোবন আশ্রমে দীক্ষা নেবেন, ৬ মনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল তার ক্ষেত্র। প াপের পরিণাম (১৯০৮) প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ আবার ফিরে আসবেন অসম্ভব আজগুবি গল্পের জগতে - পুজোর মন্ডপে বসে ডমধর শোনাবেন তাঁর অসম্ভব কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ।

ত্রৈলোক্যনাথের ভুবন অলীকের ভুবন, সমাজ বা মানুষ যা কিছু বলার তা অসম্ভবের আচ্ছাদনে প্রকাশ করতেই তিনি প ারঙ্গম। লক্ষ করতে পারি, তার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকেই গ্রহণ করতে চায়। কঙ্কাবতী বা বীরবালা-র মত গল্প তিনি শু করেন পাঠককে সম্বোধন করে, যে আড্ডায় বসেছেন আমাদের সঙ্গে। এই পর্যায়ে ফেলতে পারি ১৯০৬ সালের প্রকাশিত মজার গল্পকেও, যেখানে সরাসরি পাঠককে সম্বোধন করে অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে। কিছু গল্পে দেখছি, কথক হিসেবে লেখা অনুপস্থিত, তাঁর জায়গা নিচ্ছেন নয়নচাঁদ, ঘনশ্যামের জবানিতে সুবল গড়গড়ি অথবা ডমধর। পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করা ছাড়াও এই আড্ডার আবহাওয়া ত্রৈলোক্যনাথকে অন্য একটি স্বাধীনতা দিয়েছে, একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী কাঠামোর বদলে শিথিল গড়নের বিস্তার, যাতে গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে অন্য গল্প, লোকমুখে বেড়ে ওঠা সাহিত্যের যা অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই শিথিল ভঙ্গি তার পূর্ণ স্ফুর্তি পাবে মুক্তা - মালা বা ডম চরিতে -- যা বস্তুত আলাদা আলাদা কিছু কাহিনীকে একত্রে সন্নিবেশিত করা আরব্য উপন্যাসীয় বা বেতাল পঞ্চবিংশতি - প্রতিম ধরনকে গ্রহণ করেছে।

এই সূত্রে মনে পড়ে, ত্রৈলোক্যনাথ কখনো কখনো ব্রতকথার ছাঁদ নিয়ে আসতে চেয়েছেন তাঁর লেখায়। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাহাদের গৃহ ধনধ ান্যে পরিপূর্ণ হয়। --- এতটা স্পষ্ট করে না হলেও, ত্রৈলাক্যনাথ বহু গল্পের শেষে কথকের ভঙ্গিতে পাঠককে কিছু উপদেশ দেন, সাবধান করে দেন, ব্রতকথাকেই যে রীতির উৎস বলে আমাদের মনে হচ্ছে। লল্লুর শেষে ছাপাখানার ভূত সম্পর্কে লেখকদের সাবধান করে দেওয়া আছে, পিঠে পার্বণে চীনে ভূত গল্পের পাঠকও সববিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বন্ধু ব ান্ধবকে পিষ্টক পরমান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য প্রদান করিয়া পরিতোষ কন, ইহাই প্রার্থনা। আর তাঁহাদের এই পিষ্টকব্যাপারে গল্প লেখককে তাঁহারা বঞ্চিত না করেন, ইহাও একান্ত প্রার্থনা। --- এই ভাবে শেষ হচ্ছে।

বর্তমান লেখক বেশ কিছুদিন আগে নিতান্ত অলস কৌতূহলে বাল্যকালে পড়া কঙ্কাবতী-র পাতা ওলটাচ্ছিল। কঙ্কাবতীই

তাকে প্ররোচিত করে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাকি লেখাগুলিও পড়ে তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা করতে। সার্ধ-জন্মশতবর্ষ স্মরণের উপলক্ষ পার হয়ে পাঠক যদি এইসব লেখায় ভাবনার কিছু সূত্র পান, ত্রৈলোক্যনাথের যাবতীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও কোথাও যদি এই সময়ের পক্ষে জরি কিছু উপকরণের সন্ধান মেলে, তা হলেই যথেষ্ট।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ(দ্বিতীয় খন্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (প্রবন্ধ খন্ড প্রথম অংশ), সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৮ জুলাই ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ৩৪৫।
২. আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প, বিবিধ প্রবন্ধ(প্রথম খন্ড), তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩৮।
৩. পিতৃস্মৃতি, সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র (প্রথম খন্ড), গ্রন্থমেলা ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ষোল।
৪. সাহিত্য - সাধক - চরিতমালা - ৩৬, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পষ্ঠা - ৬।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২
৬. পিতৃস্মৃতি, সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - আঠার।